প্রসঙ্গ বাংলাদেশ : বন্যেরা বনে সুন্দর, সৈন্যেরা সেনাবাসে

অনিরুদ্ধ আহমেদ

বাংলাদেশের মানুষ সে দেশের স্বাধীনতার জন্যে যে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে সেই ইতিহাসই প্রমাণ করে যে গণতন্ত্রের প্রশ্নে তারা নিরাপোষ থেকেছে বার বার , কী পাকিস্তান আমলে , কী তার পরবর্তী সময়ও। গণতন্ত্রের বিকাশ ও তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ায় বাংলাদেশে প্রতিবন্ধকতা এসছে বার বার , কখনও সেনাবাহিনীর তরফ থেকে , কখনও ইসলামপন্থি মৌলবাদীদের তরফ থেকে , কখনও বা দূর্নীতিবাজ রাজনীতিদের দ্বারাও । কিন্তু বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পর্বতপ্রমাণ খামতি সত্বেও সাধারণ জনগোষ্ঠি গণতন্ত্রের পক্ষেই থেকেছে বরাবর।

প্রেক্ষাপটটা মনে রাখা প্রয়োজন এই জন্যে, যে বাংলাদেশের ইতিহাসে বোধ করি এই প্রথমবার সেনা সমর্থিত সরকারটি একটি তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল । এখন সেই আপাত জনপ্রিয়তা নেমে গেছে অনেকখানি , সিদুঁরে মেঘ যে ঝড়ের কারণ হতে পারে , সে ব্যাপারে অনেকেই নিশ্চিত এখন। তত্বাবধায়ক সরকারের সাময়িক জনপ্রিয়তা ছিল মূলত এক ধরণের নেতিবাচক সমর্থন বা নেগেটিভ সাপোর্ট। ২০০৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৭ সালের জানুয়ারীর ১১ তারিখ পর্যন্ত একটি পাতানো অসৎ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যে বেহাল অবস্থা হয়েছিল , তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এই তত্বাবধায়ক সরকারকে জনসাধারণ স্বাগত জানিয়েছে। এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে মূখ্য ম্যান্ডেট ছিল স্বল্পতম সময়ে একটি সংস্কারসিদ্ধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের। নির্বাচন কমিশনের সংস্কার সহ আওয়ামী লীগ নের্তৃত্বাধীন চৌদ্দ দলীয় জোট যে সব দাবী জানিয়ে আসছিল , এগারোই জানুয়ারীর পট পরিবর্তনে সরকার কার্যত সেই সব দাবীর যৌক্তিকতাই স্বীকার করে নিলো । এমনকী রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিন আহমেদ, যিনি বিএনপি জামায়াত জোটকে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন দীর্ঘ দিন , তিনিও বাধ্য হলেন ২২ শে জানুয়ারীর নির্বাচন বাতিল এবং নির্বাচন কমিশনের আমূল সংস্কারের ঘোষণা দিতে। এ সব পদক্ষেপের সঙ্গে দূর্নীতি দমনের পদক্ষেপকে ও স্বাগত জানিয়েছে জনগণ । কিন্তু দূর্নীতি দমনের এই অভিযান যদি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন না হয় তা হলে এই অভিযানের সাফল্য নিয়ে সংশয় দেখা দেবে। দুষ্ট আর শিষ্টের সংজ্ঞা নির্ধারণও করতে হবে বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সে রকম দৃষ্টিকোণ যেন মনে হয় ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে আর সে জন্যেই যে প্রত্যাশা ও আগ্রহ ছিল জনসাধারণের মধ্যে এই নতুন তত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে , মনে হচ্ছে সেই আগ্রহের জোয়ারে ভাটা পড়েছে যথেষ্ট। এই সরকার একটি ভারসাম্য বজায় রাখার যে নিরপেক্ষ চেষ্টা করছিল, সেই প্রচেষ্টা এখন লক্ষনীয় নয় ।

তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে দেয়া প্রতিশ্রুতির শর্ত পুরণে যেন ক্রমশই ব্যর্থ হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড শামসুল হুদা এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে আলাপ আলোচনা শুরু হবে এবং তা শুরু করতে না পারলে , নির্বাচনের যে রোড ম্যাপ সম্পর্কে সরকার একমত হয়েছিল সেই পথচিত্রটি বাস্তবায়ন সম্ভব নয় আর এটাতো বলাই বাহুল্য যে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যে কোন ধরণের বৈঠকের আগে নিদেনপক্ষে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দিতেই হবে। কিন্তু বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের ওপর যে কড়া সেন্সরশীপ আরোপিত হয়েছে , তাতে নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক লক্ষণ একেবারেই অনুপস্থিত। সরকারের এই দ্বিমুখী নীতির কারণেই দ্রুত এই প্রশ্ন উঠছে যে সরকারের ভেতরে কী কোন রকমের বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে ? যারা সরকার পরিচালনা করছে সেই সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যকার একটি গোষ্ঠিই কি বাংলাদেশে হৃত গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে ইতস্তত করছে ? সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে পররাষ্ট্র বিষয়ক উপ কমিটিতে শুনানী কালে কংগ্রেস সদস্যরা বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচনের আশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহও প্রকাশ করেছেন । তাঁরা এ রকম আশঙ্কা ও প্রকাশ করেছেন যে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতিতে , পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও মৌলবাদী দলগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

বস্তুত বাংলাদেশে সরকারের ভেতরেই এক ধরণের অস্থিরতা এবং "দ্বিচারিতা" বিরাজ করছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ , পরিবর্তন , বাস্তবায়ন প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা অস্থিতিশীল অবস্থা ক্রমশই পরিস্কার হয়ে উঠছে। তথাকথিত " মাইনাস টু" ফর্মূলা প্রয়োগে দ্বিমত থেকে শুরু করে হাসিনার গ্রেপ্তার , খালেদার বিলম্বিত গ্রেপ্তার, তাঁর জেষ্ঠপুত্র তারেকের মামলার চার্জশীট গঠনে গড়ি মসি , কনিষ্ঠজন কোকোকে নিয়ে দরকষাকষির পর তার বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা , খালেদার ভাই সাঈদ ইস্কান্দারের নিরাপদে দেশত্যাগ, বন্যা ত্রাণে ব্যানার বহনে নিষেধাজ্ঞা সত্বেও সেনা সমর্থনে নতুন গঠিত একটি রাজনৈতিক দলের মোটরসাইকেল বহর এ সব কিছুই প্রমাণ করে যে কোথায় যেন এক ধরণের সিদ্ধান্তহীনতা চলছে। আর এই কারণে নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুত বহুল কথিত লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বিনষ্ট হলো প্রায় অঙ্কুরেই। এই সিদ্ধান্তহীনতার সঙ্গে অতি সম্প্রতি যুক্ত হলো আরো কিছু ঘটনা , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনা সদস্যদের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘাত এবং স্বল্প সময়ে তা পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়া, কারফিউ জারী, বিকেলে শিক্ষকদের কয়েকজনের সঙ্গে সেনাসদস্যের সাক্ষাৎ এবং তাঁদের সহযোগিতা কামনা , নিরাপত্তার আশ্বাস এবং মধ্য রাতে ঢাকা ও রাজশাহীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁজ্জন শিক্ষক গ্রেপ্তার , এ সব কিছুতেই মনে হয় যে প্রশাসনের মধ্যে পরিস্কার সমন্বয়ের অভাব আছে। মনে হচ্ছে প্রশাসনের এক পক্ষ উদার , মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক,

গণতান্ত্রিক চেতনা বজায় রাখতে বদ্ধ পরিকর কিন্তু অপর শক্তিশালি অংশটি মৌলবাদী , গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরোধী এবং কঠোর রেজিমেন্টেশানের পক্ষের শক্তি। সে জন্যেই লক্ষ্য করি একদিকে বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সমাধিতে রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা জানানোর আড়ম্বর অন্যদিকে জামায়াত ও মৌলবাদীদের তোষণের প্রচেষ্টা।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পর পর সরকার পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে ,অভিযুক্ত সেনা সদস্যদের শাস্তি প্রদানের আশ্বাস সত্বেও এই প্রতিবাদ গোটা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো কি ভাবে ? লক্ষ্য করার বিষয় এই প্রতিবাদের সময়ে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কোন স্লোগান শোনা যায়নি কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় এ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। । তবে স্পষ্টতই সামরিক বাহিনীকে সেনাছাউনিতে ফিরে যাওয়ার একটা অভিন্ন আহ্বান শোনা গেছে , ছাত্র -অছাত্র সকলের তরফ থেকে। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছিল স্বতস্ফুর্ত। সেনাপ্রধান সহ সরকার এখন একটা কথা খুব জোরে শোরে বলার চেষ্টা করছেন যে কোটি কোটি টাকা ছড়িয়ে দেশে এই অরাজকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় এ ও যে বাংলাদেশে যখন কার্যত সেনা শাসন চলছে এবং চলছে দূনীতি বিরোধী অভিযান ও তখন সেনাবাহিনীর নাকের ডগা দিয়ে যদি কেউ কোটি কোটি টাকা ছড়িয়ে কোন "অরাজকতা" সৃষ্টির চেষ্টা করে তা হলে তার দায়ভারটা কিন্তু সেনাবাহিনীর ওপরই পড়ে সব চেয়ে বেশী। একজন সাবেক বিচারপতির নের্তৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে আবার এ ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কথিত অপশক্তিকে দায়ী করার মধ্যে সেই স্ববিরোধীতাই লক্ষনীয়। এই অপশক্তি কে , কারা সেটা বোধ হয় জানবার অধিকার বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে । স্পষ্টতই রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে এখন এমন শক্তি সক্রিয় নেই , থাকতে পারে না যে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই ক্ষোভ , বিক্ষোভের রূপ ধারণ করতে পারে গোটা দেশে। অতএব আহমেদ দ্বয়ের (ড ফখরুদ্দিন ও জেনারেল মঈন) অপশক্তি-তত্বটা যদি মেনে নেয়া হয়, তা হলে একটা নতুন রহস্য দেখা দেয়। কারণ এ জাতীয় অরাজকতার মাধ্যমে জরুরী অবস্থার মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার যে আরো খর্ব হবে এবং তার বিপরীতে সামরিক আধিপত্য যে আরো বৃদ্ধি পাবে, সে কথা বোঝার জন্যে রাজনীতির প্রথম পাঠই যথেষ্ট। আর সে জন্যেই এমন একটি কাজ কোন রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানীতে ঘটতে পারে , সেটা কল্পনাতীত ব্যাপার।

গণতন্ত্রমুখী চিন্তাধারার বিরোধী , যারা নির্বাচন চায় না ,যারা সামরিক শাসনকে আরো ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ করতে চায় , তারা কি তা হলে সেই অপশক্তি! সাম্প্রতিক এই বিক্ষোভ- বিস্ফোরণের কারণে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমোদন প্রদানে বিলম্ব হতে পারে এমন কথা বললেন বাংলাদেশের

আইন উপদেষ্টাও। এতে আরো পরিস্কার হলো যে যে সব অরাজনৈতিক শক্তি গণতন্ত্র ও নির্বাচন চায় না তারাই গোপনে নেড়েছে কলকাঠি। তা হলে শর্ষের ভেতরের এই অপশক্তিকে দমন করার কতটুকু শক্তি এই আহমেদ এন্ড আহমেদ সরকার প্রদর্শন করতে পারবে সেটা দেখার বিষয়। যদি অবিলম্বেই ঘরোয়া রাজনীতি চালু না হয় , যদি নির্বাচনের প্রস্তুতি আরো দ্রুত এবং সচল না হয় , তা হলে বোঝা যাবে এই অপশক্তির কাছে তিন আহমেদ (ইয়াজুদ্দিন আহমেদসহ) বিপর্যস্ত হচ্ছেন এবং বাংলাদেশ আবার ফিরে যাচ্ছে এক দীর্ঘ অমানিশার যুগে ।

অনিরুদ্ধ আহমেদ , যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক ও নিবন্ধকার ।

মতামতের জন্যে ইমেইল করুন : aauniruddho@gmail.com

- এই নিবন্ধটি ১৯শে সেপ্টেম্বর , কোলকাতার বাংলা স্টেট্সম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত।